উপসংহার

দেবেশ রায় তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস বিষয়ক গ্রন্থ 'উপন্যাস নিয়ে'র 'বাংলা উপন্যাস' প্রবন্ধের শেষ পৃষ্ঠায় বিগত সোয়াশ বছরের বাংলা উপন্যাসের গতিপ্রকৃতি, বিশেষত 'ইংরেজ পুরাণ', ভেঙে দেশীয় রীতিতে আসার চেষ্টার নানা দিক আলোচনা করে একটি যুগান্তরকারী মন্তব্য করেছেন—

"বাংলা উপন্যাসে সঞ্চারিত হয়নি লোকায়তের পৌরুষ, বাংলা উপন্যাসের কাহিনীতে আসেনি পুরাণ বা মিথ ভাঙার লোকায়তিক পেশি, বাংলা উপন্যাসের সংলাপে আসেনি আমাদের প্রতি ক্রোশে আলাদা উপভাষার খর চলিষ্ণুতা ও ব্যঙ্গ শ্লেষ রসিকতার শান।" ১

বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, মানিক, বিভূতিভূষণ, তারাশঙ্কর, সতীনাথ প্রমুখ তাবড় তাবড় কথা সাহিত্যিকদের বিখ্যাত গ্রন্থগুলি আলোচনার পর উপরোক্ত মন্তব্য অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

মন্তব্যটি আর একবার উক্ত মহান লেখকদের লেখার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে যেমন ইঙ্গিত করে সেই সঙ্গে পরবর্তী প্রতিভাবান লেখকদের নতুন সৃষ্টির খোঁজ নিতেও বলে, যেখানে দেখা মিলবে 'লোকায়তের পৌরুষ', কাহিনীতে পুরাণ বা মিথ ভাঙার লোকায়তিক পেশি' ও 'সংলাপে প্রতিক্রোশে আলাদা উপভাষার ক্ষর চলিষ্ণুতা ও ব্যঙ্গশ্লেষ রসিকতার শান'।

আলোচ্য অভিসন্দর্ভের উপসংহারে আমরা দেবেশ রায়েরই দুই যুগান্তকারী উপন্যাস 'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত' ও 'তিস্তাপুরাণ'এ এই খোঁজ চালিয়েছি, চেষ্টা করেছি তার মন্তব্যের যাথার্থ তারই রচনায় খুঁজে পাওয়া যায় কিনা। এবং দেখানো হয়েছে এতদিনের উপন্যাস রীতিতে যা সম্ভব হয়নি দেবেশ রায় দেশজ রীতিকে অবলম্বন করে উক্ত দুই উপন্যাস রচনা করে তা সম্ভব করে তুলেছেন।

'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত' তিস্তা অববাহিকা অঞ্চলের লোকজীবনের বৃত্তান্ত এবং তিস্তার জলপ্রবাহের বৃত্তান্ত। "১৬৮ কিমি দীর্ঘ তিস্তার গোটা দৈর্ঘ্যকে নয়, দেবেশ বেছে নিয়েছেন তার ছোট একটি অংশকে। তিস্তা যেখানে পার্বত্য ভূমি পেরিয়ে সমতলে এসে কালিম্পং থানা ছাড়িয়ে জলপাইগুড়ি জেলায় ঢুকেছে। সেখানে আপলচাঁদ ফরেস্ট ছাড়িয়েই যে এলাকা, যার অল্প দক্ষিণে জলপাইগুড়ি শহর, সেই এলাকা নিয়েই দেবেশ রায়ের উপন্যাস।" ২

এই এলাকার মাটি, নদী, ঝোরা, বনজঙ্গল, চর, বাঁধ, রাস্তাঘাট এককথায় ভূগোল উঠে এসেছে তার উপন্যাসে। আদি পর্ব 'গয়ানাথের জোত জমি'তে সার্ভে পার্টির নদীর পাড় ধরে জমি জরিপ, মৌজা ম্যাপ,

গয়ানাথের বিশাল জোতদারি এলাকা দিয়ে উপন্যাসের এলাকাটাকে প্রাথমিক ভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

এরপর 'বাঘারুর নির্বাসন' বন পর্বে বাঘারু যে পথ ধরে, বনবাদার, চা বাগান পেরিয়ে ডায়নার চরে গিয়ে উপস্থিত হয়েছে, উপন্যাসে এসেছে সেই পথের নিখুঁত বর্ণনা। বাঘারু আনন্দপুর চা বাগান পার হয়, কান্তদিঘি কুমার পাড়া পার হয়। এরপর কুমলাই, মাথা চুলকা, ধূপঝোড়া। বার ঘড়িয়ায় মাঠ ছেড়ে নিপুছাপুরের দিকে যাত্রা। এভাবে ক্রমে সে পৌঁছে যায় ডায়নার চরে।

চর পর্বে 'তিস্তা' যে যে এলাকা দিয়ে বয়ে গেছে সেই ছড়ানো জায়গা গুলোর বর্ণনা এরকম — "এতো জায়গায়, এত স্রোত তিস্তা দিয়ে যায় বলেই তিস্তাও যেন নিজেকে এমন ছড়িয়ে দেয়। এমনকি এই সমতলে, যেখানে তিস্তা তিস্তাই সেখানেও পশ্চিমপারে বোদাগঞ্জ, রঙধামালি, জলপাইগুড়ি, হলদিবাড়ি আর পূবপারে মাল-লাটাগুড়ি, দোমোহনি, ময়নাগুড়ি, বার্নেশঘাট, বাকালি, মেখলিগঞ্জ এই দুই পারের মাঝখানে তিস্তা মাইল মাইল ছড়ানো ছিটানো। যাকে তিস্তা বলা হয়, যে জায়গাটাকে তিস্তা বলে সব সময় দেখা হয়, দেখানো হয় তার সবটা জুড়ে ত আর কখনও জল থাকে না। তিস্তা কোন নদী নয়, এক একটা ভূখণ্ড।..... তিস্তা তো একটি নদী নয়-একটি নদীর ভেতরেই অনেক নদী।" ৩

তাহলে তিস্তার ভেতরেই পড়ে নিতাইদের চর, চর ২ নম্বর, কাশিয়াবাড়ি, বোয়ালমাড়ি, মউয়ামাড়ি থেকে বাংলাদেশ সীমান্ত পর্যন্ত দহগ্রাম ইত্যাদি চর এলাকা।

বৃক্ষ পর্বে আপলচাঁদ থেকে নিতাইদের চর এবং চরুয়ারা যে বাঁধে আশ্রয় নিয়েছে সমস্ত নদী পথ ও পার্শ্ববর্তী এলাকা এসেছে উপন্যাসে।

মিছিল পর্বে এসেছে ময়নাগুড়ি, ধূপগুড়ি, ফালাকাটা, আলিপুরদুয়ার হয়ে আসাম সংলগ্ন অঞ্চল ও আসামের বঙ্গাইগাঁও ও মালিগাঁও পর্যন্ত। পশ্চিম দিকে জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি, নকশালবাড়ি, বিহারের ঠাকুরগঞ্জ, কিষাণগঞ্জ, ডালখোলা ইত্যাদি এলাকা।

'অন্ত্য' পর্বে পুবে তোর্সার পার থেকে মাদারিহাট, গয়েরকাটা, চালসা ওদলাবাড়ি হয়ে গাজলডোবা, তিস্তা ব্যারেজের স্থল পর্যন্ত বন-পাহাড়-নদী, চা বাগান অধ্যুষিত পথ। এই ভুগোলে বিধৃত হয়ে আছে 'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত'।

এই উপন্যাসের ইতিহাস প্রায় সমকালীন। ১৯৬৮'র বন্যার প্রায় বছর দশেক পর বামফ্রন্টের আমলে গাজলডোবার জমি জরিপের কাজ শুরু হয়। "স্পেশাল সেটলমেন্টের জরিপের কাজ শুরু হল ৭৭ সাল

নাগাদ।" ৪

জরিপের উদ্দেশ্য—গাজলডোবায় তিস্তার ওপর ব্যারেজ নির্মাণ করা। জমি জরিপ ও ব্যারেজ তৈরি এই বিষয়টিকে নিয়েই উপন্যাসের মূল বৃত্তান্ত চলতে থাকে। তার সাথে যুক্ত হয় আর এক ইতিহাস। দেশ ভাগের ফলে উদ্বাস্তু বাঙালীদের তিস্তাপারের চরভূমিতে বসবাস করার ইতিহাস। কৃষক সমিতির খাশ জমি দখল, জরিপওয়ালাদের সঙ্গে দ্বন্দ্ব, বচসা কিংবা চা শ্রমিকদের সঙ্গে ঝগড়া বিবাদ মূলত ওই পূর্ববঙ্গাগত ভাটিয়াদেরই।

জমিখাশ করে ব্যারেজ নির্মাণ, বনভূমির ক্ষতি সাধন ইত্যাদি বিষয়কে সামনে রেখে আর এক সমকালীন ইতিহাস উত্তরখণ্ড আন্দোলন। প্রসঙ্গক্রমে আলোচিত হয়েছে রাজবংশীদের অতীত ইতিহাস। ১৫১০ থেকে ১৭৭৩ পর্যন্ত স্বাধীন ভাবে তারপর ১৯৪৯ পর্যন্ত করদ দেশীয় রাজা হিসাবে মোট ৪৪০ বছর রাজবংশী রাজার শাসনের ইতিহাস। তারপর ক্ষত্রিয় সমিতির আন্দোলন। ১৮৯০ থেকে ১৯৩০/৩৫ পর্যন্ত এই আন্দোলন চলাকালীন রাজবংশীয়রা ক্ষত্রিয় বলে পরিচয় দিয়ে পৈতে পরা শুরু করে।

তিস্তাপারের রাজনীতি ও মূলত তিস্তা ব্যারেজকে নিয়ে। ১৯৬৭, ও ১৯৬৯ সালে দু'দুবার পশ্চিমবাংলায় অকংগ্রেসী সরকার ক্ষমতায় আসে। তারা ক্ষমতায় এসে ভূমি সংস্কারে হাত দেয়। খাশজমি উদ্ধার, ভূমিহীনদের মধ্যে তা বন্টন, জমি খাশ করে উন্নয়নমূলক কাজে লাগানো, কৃষক ও শ্রমিকের স্বার্থরক্ষামূলক কাজ শুরু করা এবং তাতে গয়ানাথ, সম্পৎ রায়দের মত জোতদারদের অসুবিধায় পড়তে হয়। তারা এবং প্রধানত হেরে যাওয়া কংগ্রেসী লোকেরা মিলে উত্তরখণ্ড দল গঠন করে। উত্তরখণ্ডের লক্ষ রাজবংশী ঐতিহ্য বা গৌরবকে স্মরণ করে কামতাপুর রাজ্য গঠন করা, যুক্তফ্রন্ট, পরে বামফ্রন্ট সরকারের ভূমিনীতির বিরুদ্ধাচারণ করা। সেই সঙ্গে তিস্তা ব্যারেজের বিরুদ্ধে রাজবংশীদের রুখে দাঁড়ানোর আহ্বান।

আর বামফ্রন্টের চ্যালেঞ্জ এই সব বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনকে রাজনৈতিক ভাবে পরাস্ত করে উন্নয়নের ধারাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া।

এই দুই বিপরীত মুখি আন্দোলন ময়নাগুড়ি সম্মেলনে এক বিশেষ রূপ নেয়। শ্রীদেবীর ফাংশানকে সামনে রেখে উত্তরখণ্ডীরা যে জনসমাবেশের আয়োজন করেছিল, জল্পেশযাত্রার ধর্মীয় ভাবাবেগ তৈরি করে যে মিছিলের ব্যবস্থা করেছিল বামপন্থীদের তথা সরকারি প্রচেষ্টায় তা হাস্যকরভাবে বিফল হয়ে যায়। আসন্ন নির্বাচনের কথা ভেবে অসমাপ্ত ব্যারেজ উদ্বোধনের ব্যবস্থা ও সেজন্য সারা উত্তরবঙ্গ তোলপাড় করে বামপন্থীদের হাজার হাজার লোকের মিছিলে একদিকে যেমন ভোটের প্রস্তুতি তেমনি, অন্যদিকে উত্তরখণ্ড আন্দোলনকারীদের

নিস্প্রভ করে দিয়ে বোঝানো যে জনগণ আসলে ব্যারেজের পক্ষে, বামফ্রন্টের পক্ষে। এছাড়া পুলিশ দিয়েও উত্তরখণ্ডীদের ব্যারেজ বিরোধী মিছিল ভেঙে চুরমার করে দেওয়া হয়। এককথায় গাজলডোবার ব্যারেজের উদ্বোধন উপলক্ষে যে রাজনীতি সংগঠিত হয় তা সম্পূর্ণভাবে বামফ্রন্টের পক্ষে চলে যায়। তবু লেখক দেখিয়েছেন যে এই উন্নয়ন সর্বস্তরের মানুষের কল্যাণ সাধন করতে পারে না। বিশেষত মাদারি, মাদারির মা বা বাঘারুদের মত দারিদ্র্য সীমার অনেক অনেক নিচে বসবাসকারী মানুষদের।

তিস্তাপারের বৃত্তান্তে শুধু তিস্তাপারের ভুগোল, ইতিহাস, রাজনীতি, সমাজতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব বা অর্থনীতির কথাই আলোচিত হয়নি আলোচনায় স্থান পেয়েছে রাজবংশী জীবনের বিশ্বাস, রীতিনীতি, ছড়া, গান, ফাকালী, প্রবাদ, রসরসিকতা ও তাদের মুখের ভাষা।

'তিস্তাপুরাণে'র ও ভূগোল তিস্তাপার। ধূপগুড়ি ব্লকের দলগাঁও-সরুগাঁও গ্রাম দশনদী বিশ নদীর পৃথিবী। এখানকার সব কিছুর পরিচয় ব্যাখ্যা পুরাণের ভাষায়। মূল কেন্দ্র দলগাঁও-সরুগাও হলেও সারা উত্তরবঙ্গই এর ভূগোল। এই ভৌগোলিক সীমায় বিধৃত হয়ে আছে অসংখ্য ছোট বড় নদী, আর বুড়িমার গোত এবং গোটা রাজবংশী সমাজ। তিস্তাপারের বৃত্তান্তে যে রাজবংশী সমাজের পরিচয় পাওয়া গেছে, নৃতত্ত্বের চুলচেরা বিচারে, ইতিহাসের সন তারিখের নিরিখে। এখানে, এই পুরাণে রাজবংশীর পরিচয় পাওয়া যায় তাদের দৈনন্দিনে, আকার আকৃতিতে, চলনে, বলনে, কথনে, আচার বিচার আদব কায়দায়। তাদের ঘর দরজা, পোশাক-পরিচ্ছদ, কথা বলার ধরন, খাওয়া-দাওয়ার ধরন, পূজাপার্বণ, রীতিনীতি ইত্যাদি বুঝিয়ে দেয় যে এরা রাজবংশী। ভাষা তো আর একটি মুখ্য উপায়।

লেখক সযত্নে এই জনগোষ্ঠীর স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করেছেন।

এখানেও রাজনীতির কথা এসেছে বুড়িমার গোতের প্রসঙ্গেই। লেভি, জোতদার-আধিয়ার সম্পর্ক, জমি দখল, বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, তাদের ক্রিয়া কর্ম। বর্গা রেকর্ড, দলহীন, ঝাণ্ডাহীন, জমিদখলে ব্যর্থতা, ছোটদাদার মানুষের প্রকৃত মুক্তির বার্তা নিয়ে ক্ষুধার দিকে গিয়ে ফিরে আসার জন্য অপেক্ষা। বুড়িমার বিসর্জনে পুরাতনের বিদায়, নতুনের আগমন। অতএব তিস্তাপারের বৃত্তান্ত থেকে আমরা পেলাম সমকালীন সময়ের উত্তরবঙ্গের রাজনীতি, বামশাসিত উত্তরবঙ্গে উন্নয়নের ধারায় ভূমি সংস্কার তিস্তাব্যারেজ জাতীয় নদী বাঁধের কথা এবং অবশ্যই তিস্তানদীর স্বরূপ।

আর তিস্তাপুরাণ থেকে পেলাম বুড়িমার মিথের আড়ালে একটা সমগ্র রাজবংশী সমাজ। তাদের জীবন

প্রবাহে রাজনীতি, জীবনচর্চা, দৈনন্দিন, জন্মমৃত্যু, সংস্কৃিয়া। তাদের কথাবার্তা, হাস্যপরিহাস, প্রবাদ প্রবচন, রীতি, পার্বণ ইত্যাদি অনেক কিছু।

আজ থেকে প্রায় ৭০ বছর আগে ওপার বাংলার এক অজগ্রামে যে বাড়িতে ডাকযোগে ষ্টেটসম্যান যেত এবং বৃদ্ধ, অন্ধ দাদুকে ইংরেজি অক্ষরের আকৃতি বলে বলে যাকে পত্রিকা পড়তে হত, সেই বাড়ির সেই ছেলেটি দেবেশ রায়। যিনি ভাল করে বাংলা শেখার আগে ইংরেজি অক্ষর চিনেছিলেন। যিনি মাত্র ১৪ বছর বয়সে কমিউনিস্ট পার্টি করার জন্য এ্যারেষ্ট হয়েছিলেন, যিনি লেখক, সমালোচক, সম্পাদক, রাজনীতিক এবং যার কলম এখনও সৃষ্টিশীল। সেই দেবেশ রায়ের সত্তরোর্ধ জীবন ঘটনাবহুল হবে, তা খুবই স্বাভাবিক।

কিন্তু আমরা আমাদের সন্দর্ভের প্রয়োজনে প্রথম অধ্যায়ে অত্যন্ত সামান্য ভগ্নাংশ মাত্র আলোচনা করেছি। শৈশবের কিছু স্মৃতি আলোচিত হয়েছে তাঁর বাল্য জীবনের পারিবারিক, পারিপার্শ্বিক পরিবেশ বোঝাবার জন্য। আলোচনা করা হয়েছে তাঁর রাজনৈতিক জীবন। কারণ তাঁর ব্যক্তি সত্তা গড়েই উঠেছে কমিউনিস্ট মতাদর্শে এবং যাকে অবলম্বন করে তার লেখক সত্তাও পুষ্টি লাভ করেছে।

তাঁর কর্মজীবনের একটা বড় সময় কেটেছে সাংবাদিকতায়। তথ্যনিষ্ঠ, যুক্তিপূর্ণ রচনার জন্য সাংবাদিক গদ্য খুবই সহায়ক বলে তিনি মনে করেন। উপন্যাস লেখার ক্ষেত্রে এর প্রয়োজনীয়তার কথা তিনি উল্লেখ করেছেন।

আমরা যে দুটি যুগান্তকারী উপন্যাস তিস্তাপারের বৃত্তান্ত ও তিস্তাপুরাণ আলোচনা করেছি তা রচনা করার আগে তাঁর যে গল্প উপন্যাসের একটা ধারা রয়েছে, সঙ্গত কারণে সেই ধারার মূল বিষয় গুলি স্পর্শ করাও জরুরী। সে জন্য তিনি কীভাবে গল্পকার থেকে ঔপন্যাসিক হয়েছেন এবং কীভাবে নানা উপন্যাসের ভেতর দিয়ে তিস্তাপারের বৃত্তান্ত এবং তিস্তাপুরাণ লিখেছেন তা আলোচনা করা হয়েছে এই প্রথম অধ্যায়ে। তিস্তাপারের বৃত্তান্ত ও তিস্তাপুরাণের অতি সংক্ষিপ্ত রূপ এতে ঠাঁই পেয়েছে। বৃত্তান্ত মূলক আর একটি রচনা 'সময় অসময়ের বৃত্তান্ত'রও কাহিনি সংক্ষেপ করে পরিচয় দেওয়া হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে গবেষণার জন্য গৃহীত মূল দুই উপন্যাস 'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত' ও 'তিস্তাপুরাণ'-এর পরিচয় জ্ঞাপক আলোচনা। আলোচনা করা হয়েছে দু'ভাবে। এক)পর্ব গুলির বিন্যাস দেখানো, দুই) কাহিনি সংক্ষেপ। উপন্যাসের যে প্রচলিত উপাদান প্লট, চরিত্র, কাহিনি, দেবেশ রায় সেই ধারা থেকে সরে এসে এপিসোডিক ধরনে এই দু'খানি উপন্যাস লিখেছেন। সে জন্য উপন্যাসের নিটোল কাহিনি এর মধ্যে পাওয়া যাবে না। পর্ব

ও পর্বের অন্তর্গত অধ্যায় গুলির স্বাধীন, স্বতন্ত্র, অস্তিত্ব পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত করে যে টুকু কাহিনির আদল এসেছে তাই এই অধ্যায়ে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। তাই একে বিষয়সংক্ষেপও বলা যেতে পারে। উপন্যাস দু'খানির কাহিনি সংক্ষেপ বা বিষয় সংক্ষেপ মূল গবেষণায় প্রবেশের পক্ষে প্রয়োজনীয় বোধ হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ের বিষয় রচনা রীতি ও স্বরূপ বিচার। রচনা রীতির ব্যাপারে দেবেশ রায় ইংরাজি মডেল মুক্ত দেশজ রীতিকেই অনুসরণ করেছেন। সেজন্য প্রচলিত আদি-মধ্য-অন্ত্য সমন্বিত কাহিনি বিন্যাস এড়িয়ে মহাকাব্যিক ধরনের একটি কথা বৃত্তের সূত্র ধরে অন্য কথা বৃত্তে চলে যাওয়া, বিষয়কে টুকরো টুকরো এপিসোড তৈরি করে বক্তব্যকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া, কথার বিস্তার ঘটিয়ে অনুপুঙ্খ বর্ণনায় বিষয়ের অভ্যন্তরে প্রবেশ করা তাঁর রচনার বিশেষ রীতি। গল্পের সূত্রে গল্প বলার যে প্রাচীন রীতি আমাদের রূপ কথায়, পঞ্চতন্ত্র , হিতোপদেশে দেখা যায়, দেবেশ রায় তার অনুসরণ করেছেন। এসেছে গল্প বা বিষয়ের ফাঁকে ফাঁকে তত্ত্বকথা শোনানোর ধরন।

আধুনিকতার মূল সুর নিহিত আছে মানবতার মুক্তিতে। শুধু কালের বিচারে আধুনিক হলেই হয় না। বিষয়, বিষয়কে উপস্থাপন করার রীতি, ভাষা, প্রান্তীয় মানুষের কথা, সর্বোপরি এই মানুষের মুক্তির পথ নির্দেশনা আধুনিকতার মাপকাঠি। সে বিচারে দেবেশ রায়ের তিস্তাপারের বৃত্তান্ত ও তিস্তাপুরাণ দুই-ই আধুনিক উপন্যাস। এই অধ্যায়ে তা আলোচনা করা হয়েছে।

স্বরূপ বিচারে উপন্যাসদ্বয় উপন্যাস শ্রেণির কোন দলভুক্ত সে সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। বাংলা উপন্যাস নানা শ্রেণিতে বিভক্ত। রোমান্স ধর্মী উপন্যাস, সামাজিক উপন্যাস, ঐতিহাসিক উপন্যাস, চরিত্র উপন্যাস, আঞ্চলিক উপন্যাস, কাব্যোপন্যাস, আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস, পত্রোপন্যাস, চেতনাপ্রবাহমূলক উপন্যাস, মহাকাব্যিক উপন্যাস। কোন কোন উপন্যাস একটি নির্দিষ্ট শ্রেণিভুক্ত হতে পারে। আবার কোন কোন উপন্যাসে একাধিক শ্রেণির লক্ষণও দেখা দিতে পারে। সে জন্য নির্দিষ্ট ভাবে অনেক উপন্যাসকে একটি নির্দিষ্ট শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত করা সহজ হয়না।

দেবেশ রায়ের এই উপন্যাস দুটির মধ্যেও একাধিক শ্রেণি লক্ষণ বর্তমান। তাই একটি বিশেষ শ্রেণিভুক্ত করা বড় কঠিন। তবু যে শ্রেণি লক্ষণ তুলনায় অধিক উপন্যাস দুখানিকে সেই শ্রেণির অন্তর্গত করে বলা হয়েছে উপন্যাস দু'খানি মহাকাব্যিক।

উপন্যাসের রচনারীতিরই একটি প্রধান অঙ্গ হল তার ভাষা রীতি। ভাষা উপন্যাসের প্রাণ, মূল নিয়ন্ত্রক

শক্তি। সে জন্য ভাষা বিষয়ক একটি পৃথক অধ্যায় গড়ে দেবেশ রায়ের নিজস্ব ভাষা শৈলীর বিশদ পরিচয় জ্ঞাপন করা হয়েছে। দুটি উপন্যাসের ভাষা বৈশিষ্ট্য পৃথক পৃথক ভাবে আলোচিত হয়েছে। বাক্য বিন্যাস, দীর্ঘ জটিল বাক্য, ছোট সরল বাক্য, প্রশ্নোবোধক বাক্য, বহুস্বর ইত্যাদি ভাষার সৌন্দর্য, প্রবাহমানতা এবং অর্থকে নানাস্তরে বিন্যস্ত করার সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। উপন্যাসের কথা বস্তুকে সঠিক অর্থে রূপ দেওয়ার জন্য ভাষার এই বৌদ্ধিক নির্মাণ সামগ্রিক ভাবে উপন্যাস দু'খানিকে মহিমান্বিত করে তুলেছে।

রাজবংশী ভাষার সঠিক ও স্বচ্ছন্দ প্রয়োগ উপন্যাস দুখানির ভাষার ভুবনকে আরও বেশি সমৃদ্ধ করেছে। একই বিষয় অবলম্বনে একই রচনারীতি অনুসরণ করে শুধু শিষ্ট বাংলায় উপন্যাস দু'খানি তিনি রচনা করতে পারতেন। কিন্তু তা কখনোই বর্তমান তিস্তাপারের বৃত্তান্ত ও তিস্তাপুরাণ হত না। আবার শুধু রাজবংশী ভাষার আঞ্চলিক ধরনেও উপন্যাস দু'খানি লেখা যেত, তবে তা হত নিছকই অন্যান্য আর পাঁচখানা আঞ্চলিক উপন্যাসের মতো।

কিন্তু লেখক তা করতে চাননি। তিনি চেয়েছেন দু'খানি মহাকাব্য রচনা করতে। আর সেই জন্যই সচেতন ভাবে আঞ্চলিক ভাষার আদলটি তিনি গ্রহণ করেছেন। রাজবংশী ভাষার ব্যাকরণ গত দিকটির দিকে তিনি যত নজর দিয়েছেন তার চেয়ে বেশি নজর দিয়েছেন এই ভাষার ব্যবহারে কথা কত ভিন্ন ভিন্ন স্তরে তার অর্থ প্রকাশ করতে পারে তার দিকে। উপন্যাসে চিত্রকল্প রচনা, বাস্তব ও সজীব করে তোলার ক্ষেত্রে রাজবংশী ভাষা মন্ত্রবৎ কাজ করেছে। যার মুখে, যে পরিবেশে, রাজবংশী ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে সেই চরিত্র ও বিষয়টি প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে।

এই চতুর্থ অধ্যায়ে রাজবংশী ভাষার ধ্বনিতাত্ত্বিক ও রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য গুলি প্রথমে আলোচনা করে ভাষার স্বরূপটি বোঝাবার চেষ্টা করা হয়েছে। তারপর দুই উপন্যাসে এর প্রয়োগ দেখানো হয়েছে। এক্ষেত্রেও বর্ণনার ভাষায় রাজবংশী প্রয়োগ, শিষ্ট বাংলায় রাজবংশী শব্দ, বাক্য প্রয়োগ, পাত্রপাত্রীর মুখে রাজবংশী ভাষা নানা দিক থেকে বিচার করা হয়েছে। এ ভাষার শুদ্ধতা-অশুদ্ধতা নিয়েও কিছু মতামত তুলে ধরা হয়েছে। সর্বোপরি উপন্যাস দুখানিতে রাজবংশী ভাষার প্রয়োগ যে উপন্যাস দুখানিকে মহাকাব্যিক মর্যাদায় ভূষিত করেছে তাও বলা হয়েছে। 'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত' ও 'তিস্তাপুরাণ' দুটি উপন্যাসেরই শিরোনাম যে তিস্তা নদী, সেদিক থেকে দুটি উপন্যাসই নদী কেন্দ্রিক। স্বাভাবিক ভাবে দুটি উপন্যাসে 'তিস্তা'র ভূমিকা কি তা নিয়ে একটা অধ্যায় প্রয়োজন। পঞ্চম অধ্যায়টিতে তা আলোচনা করা হয়েছে।

সভ্যতার বিকাশে নদীর ভূমিকা, ভারতীয় সভ্যতার বিকাশে নদীর ভূমিকা এবং বাংলার নদী সম্পর্কে কিঞ্চিৎ উল্লেখ করে বাংলা নদী কেন্দ্রিক উপন্যাসের কথায় আসা হয়েছে। এবং পদ্মানদীর মাঝি, তিতাস একটি নদীর নাম ও গঙ্গা এই তিন খানি উপন্যাসে নদী কিরূপে দেখা দিয়েছে তা আলোচনা করা হয়েছে। সেই সূত্রেই আমাদের আলোচ্য তিস্তাপারের বৃত্তান্ত ও তিস্তাপুরাণে তিস্তা কী ভূমিকা পালন করেছে তা সবিস্তারে বলা হয়েছে। এই দুই উপন্যাসে নদীর ভূমিকা দু'রকম। তিস্তাপারের বৃত্তান্তে নদীর নিজস্ব রূপ কখনো বন্যার, কখনো নিসর্গের। আবার নদী অন্বিত রাজবংশী ও ভাটিয়ারাও কিভাবে এই নদীকে ব্যবহার করেছে তাও আলোচনায় এসেছে।

তিস্তাপুরাণে, নদী বন্যা রূপে পাহাড়ের খাদে ঝুলে আছে। কবে আসবে, কিংবা আদৌ আসবে কিনা, বা এসেও গেছে হয়তো এরকম পৌরাণিক ভাবনার নদী। তবু তাকে নিয়েই বুড়িমার গোত্র বা বংশের দিন যাপন। তিস্তা ছাড়াও আরও কিছু নদী যেমন জলঢাকা, বড়বাঁক, আংড়াভাসা, নোমাই, গোলুন্দি, দুদুয়া ইত্যাদির কথাও এসেছে।

নদী শুধু নদী নয়, সংস্কৃতিরও বাহন। তাই তিস্তা পূজিতা হন তিস্তাবুড়ি হিসেবে। নদীকে নিয়ে নানা অনুষ্ঠান পূজাপার্বণ, গান বাঁধা হয়। এই ভাবে জীবনের সঙ্গে জুড়ে থাকে তিস্তা।

সমগ্র গবেষণা কর্মটিকে আমি অধ্যায় পরম্পরায় সাজিয়ে উপসংহারে এসে শেষ করেছি। আমার গবেষণা-চক্রের সিদ্ধান্ত হল এই উপসংহার। বানান বিষয়ে বাংলা আকাদেমির বানান বিধি অনুসরণ করেছি। তবে যুক্তবর্ণ ব্যবহারে পুরোনো রীতি অনুসৃত হয়েছে।

উল্লেখপঞ্জি

১। উপন্যাস নিয়ে, দেবেশ রায়, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, কলকাতা, পুস্তক মেলা, জানুয়ারী ২০০৩, পৃঃ ৪১

২। বাংলা উপন্যাস ও তার আধুনিকতা, সত্যেন্দ্রনাথ রায়, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-জানুয়ারী, ২০০০, পৃঃ ৩২০

৩। তিস্তাপারের বৃত্তান্ত, দেবেশ রায়। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, একাদশ সংস্করণ, ২০০১, পৃঃ ১৯৮।

৪। তদেব পৃঃ ৪৪৫